International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 142-153
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.277

বৈচিত্র্যে ঐক্য ও গণতন্ত্র: বিভক্ত বিশ্বে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক পথপ্রদর্শক

চণ্ডী চরণ লেট
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 03.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the contemporary global order, democracy is passing through a complex and crisis-ridden phase. Although regular elections are held in many countries, the fundamental elements of democracy – rule of law, institutional balance, minority rights, and civil liberties – are gradually weakening. In this context, India emerges as an important comparative example. Despite its deep diversity based on language, religion, caste, region, and class, India has sustained a democratic system of governance continuously since independence.

This paper argues that India's democratic resilience is not the result of social homogeneity; rather, it is grounded in a set of multidimensional institutional arrangements, including an inclusive Constitution, a federal structure, reservation policies, multi-party political competition, and an independent judiciary. At the same time, the paper critically examines contemporary challenges such as majoritarianism, centralization of power, social inequality, and concerns over civil rights.

Keywords: Pluralism, democratic resilience, Constitution, federal structure, reservation policy, judiciary

ভূমিকা:

বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমানে বিস্তৃত বিতর্ক চলছে। একদিকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংখ্যার বিচারে বিস্তার লাভ করেছে এবং অধিকাংশ দেশেই নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে; অন্যদিকে গণতন্ত্রের গুণগত মান—যেমন আইনের শাসন, ক্ষমতার ভারসাম্য, সংখ্যালঘু অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন—বহু ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। নির্বাচন হচ্ছে, কিন্তু বিরোধী কণ্ঠস্বর সংকুচিত হচ্ছে; সংসদ ও আদালত বিদ্যমান থাকলেও তাদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংবিধান বহাল থাকলেও সাংবিধানিকতার বাস্তব চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে গণতন্ত্রের বাহ্যিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভারত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় আলোচ্য বিষয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত একটি লিখিত সংবিধানের অধীনে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রয়েছে। দেশভাগের বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন, নিম্ন শিক্ষার হার এবং ভাষা-ধর্ম-জাতিভিত্তিক গভীর সামাজিক বিভাজন সত্ত্বেও ভারত গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। নিয়মিত সাধারণ নির্বাচন, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, সক্রিয় বিরোধী দল এবং স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধারাবাহিকতার ভিত্তি গঠন করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে ভারতের

নির্বাচন কমিশন, যা কোটি কোটি ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক নয়, সামাজিক বাস্তবতায় রূপ দিয়েছে।

সুতরাং ভাষা, ধর্ম, জাত ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি সমাজে কীভাবে সমতাভিত্তিক সংবিধান, বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা বণ্টন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যের মাধ্যমে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা যায়— ভারত তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এই প্রবন্ধে সেই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক দৃঢ়তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো: বহুত্ববাদ ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা:

বহুত্ববাদ বলতে এমন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বোঝায়, যেখানে একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন পরিচয়ভিত্তিক গোষ্ঠী সহাবস্থান করে। এই গোষ্ঠীগুলি ভাষা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়, বর্ণ কিংবা সামাজিক শ্রেণির ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। বহুত্ববাদী সমাজে নাগরিকদের রাজনৈতিক আনুগত্য একমাত্রিক নয়; বরং তারা একাধিক পরিচয়, স্বার্থ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অধিক জটিল হয়ে ওঠে, কারণ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক দাবি, স্বার্থ এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আশঙ্কার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় বজায় রাখতে হয়।

রাজনৈতিক তাত্ত্বিক আরেন্ড লিজফার্ট তাঁর গ্রন্থ ডেমোক্রেসি ইন প্লুরাল সোসাইটিজ- এ যুক্তি প্রদান করেন যে, গভীরভাবে বিভক্ত সমাজে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। কারণ, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসেবে কার্যকর হয়, তবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বঞ্চনা, নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে তিনি সমঝোতামূলক গণতন্ত্রের ধারণা উপস্থাপন করেন। এই ধারণার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে—ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, গোষ্ঠীগত স্বীকৃতি, অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণে সংখ্যালঘু স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। তাঁর মতে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, আস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বিভক্ত সমাজে সংঘাত হ্রাস করে এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আংশিকভাবে এই সমঝোতামূলক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে; যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও ভারত সম্পূর্ণরূপে সমঝোতামূলক গণতন্ত্র অনুসরণ করে না— কারণ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনী পদ্ধতি কার্যকর—তবুও এর বহুস্তরীয় প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বৈষম্যহীন নিয়মাবলী বহুত্ববাদী সমাজে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সংবিধান: বৈষম্যহীন ভিত্তি:

ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করে গণপরিষদ। এই গণপরিষদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ও সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, যা সংবিধান রচনাকে একটি সর্বজনীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত করে। সংবিধান প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন বি. আর. আম্বেদকর, যিনি খসড়া প্রণয়ন

কমিটির সভাপতি হিসেবে সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন।

ভারতের সংবিধান কেবল শাসনব্যবস্থার কাঠামো নির্ধারণ করেনি; বরং এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক চুক্তি হিসেবে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—

সমতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪–১৮): আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা, বৈষম্যবিরোধী নীতি এবং অস্পৃশ্যতা বিলোপের ঘোষণা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯–২২): মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষা গণতান্ত্রিক চর্চার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ২৫–২৮): প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রসারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন।

সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৯–৩০): ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে রক্ষা করে।

এই সাংবিধানিক কাঠামো বিভিন্ন পরিচয়ভিত্তিক গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের ভেতরে মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে এবং তাদের দাবি উত্থাপনের বৈধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। ফলে সামাজিক বৈচিত্র্য সংঘাতের কারণ না হয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বৈষম্যহীন এই ভিত্তিই ভারতের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান শক্তি।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন:

স্বাধীনতার পরপরই ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবি তীব্র আকার ধারণ করে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রশাসনিক সীমারেখা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশেষত তেলুগুভাষী জনগোষ্ঠীর পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন এবং পট্টি শ্রীরামুলুর অনশন এই প্রশ্নকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। ফলস্বরূপ, ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন-এর মাধ্যমে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আন্ধ্রপ্রদেশ (তেলুগু ভাষাভিত্তিক), মহারাষ্ট্র (মারাঠি ভাষাভিত্তিক), কর্ণাটক (কন্নড় ভাষাভিত্তিক), কেরল (মালয়ালম ভাষাভিত্তিক) এবং গুজরাট (গুজরাটি ভাষাভিত্তিক) প্রভৃতি রাজ্য ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। অন্যদিকে, হরিয়ানা (হিন্দিভাষী অঞ্চল) ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে দমন না করে বরং তাকে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিচয় ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের তাৎপর্য ছিল বহুমাত্রিক। প্রথমত, এটি আঞ্চলিক পরিচয়কে বৈধতা প্রদান করে এবং জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করে। দ্বিতীয়ত, এটি সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ও সহিংস আন্দোলনের ঝুঁকি হ্রাস করে, কারণ মানুষ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি রাষ্ট্রের

কাঠামোর মধ্যেই লাভ করে। তৃতীয়ত, এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করে তোলে।

সুতরাং, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন প্রমাণ করে যে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নমনীয়, বাস্তববাদী এবং বহুত্ববাদকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সক্ষম। এই পদক্ষেপ বহুত্ববাদী সমাজে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো:

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সাংবিধানিক বণ্টন নির্ধারিত হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী ভারতকে "রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও এই পরিভাষা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের ইঙ্গিত প্রদান করে, তবুও কাঠামোগতভাবে ভারতের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো—জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

সংবিধানের সপ্তম তফসিলে তিনটি তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা।

কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১০০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (পূর্বে ৯৭টি ছিল), যার মধ্যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, পারমাণবিক শক্তি, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য এবং রেলপথের মতো জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এককভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং নীতিগত ঐক্য বজায় রাখা হয়।

রাজ্য তালিকায় মোট ৬১টি বিষয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, (পূর্বে ৬৬টি ছিল) এর মধ্যে কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ, জনশৃঙ্খলা, ভূমি এবং স্থানীয় প্রশাসনের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব বিষয় রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় তারা নিজ নিজ অঞ্চলের সামাজিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং আঞ্চলিক পরিচয় যথাযথভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

যুগ্ম তালিকা তালিকায় ৫২টি বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে শিক্ষা, বন, শ্রম আইন, বিবাহ এবং দণ্ডবিধির কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে কোনো দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পায়— যা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি কেন্দ্রাভিমুখী বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এই তালিকার মূল উদ্দেশ্য হলো সারা দেশে আইনের সমতা বজায় রাখা, আবার স্থানীয় বৈচিত্র্যকেও গুরুত্ব দেওয়া।

আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় ভারতের অর্থ কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮০ অনুযায়ী এটি গঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কর-রাজস্ব বণ্টনের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। এর মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সমবণ্টিত উন্নয়নের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্রুপদী যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিরূপ নয়; বরং এটি এক ধরনের কেন্দ্রাভিমুখী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। তথাপি, ক্ষমতার এই সাংবিধানিক বণ্টন বহুত্ববাদী সমাজে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি প্রদান এবং গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংরক্ষণ নীতি ও সামাজিক ন্যায়:

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে সংরক্ষণ নীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে বিভিন্ন বিশেষ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের ১৫(৪) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। ১৬(৪) অনুচ্ছেদ সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের বিধান অনুমোদন করে। উল্লেখ্য, ১৫(৪) অনুচ্ছেদটি ১৯৫১ সালের প্রথম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়, যা সংরক্ষণ নীতির সাংবিধানিক ভিত্তিকে আরও সুস্পষ্ট করে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ সংবিধানের ৩৩০ ও ৩৩২ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়ও তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। পাশাপাশি, নারীদের জন্য কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ (অনেক রাজ্যে ৫০ শতাংশ) আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর ফলে প্রান্তিক গোষ্ঠী ও নারীরা সরাসরি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং তৃণমূল স্তরে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। একই সঙ্গে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় গণতন্ত্রের সর্বজনীন চরিত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। পরবর্তীকালে মণ্ডল কমিশন (১৯৭৯) সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণি চিহ্নিত করে সংরক্ষণের সুপারিশ প্রদান করে। ১৯৯০ সালে কেন্দ্র সরকার কমিশনের সুপারিশ আংশিকভাবে কার্যকর করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করে। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক ইন্দ্রা সাহনি মামলার রায়ে সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা সাধারণত ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয় এবং ক্রিমি লেয়ার নীতি প্রবর্তিত হয়।

বর্তমানে সংবিধানের ১৫(৬) ও ১৬(৬) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির (ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনস) জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে পূর্বে শুধুমাত্র সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ সংরক্ষণ নীতির পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সংরক্ষণ নীতি শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত করেছে। তবে এটি বিতর্কমুক্ত নয়—বিশেষত মেধা বনাম সামাজিক ন্যায়, আর্থিক মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্তি এবং সংরক্ষণের বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, সংরক্ষণ ব্যবস্থা কেবল একটি কল্যাণমূলক নীতি নয়; এটি ভারতের সংবিধানে ঘোষিত সামাজিক ন্যায় ও বাস্তব সমতার নীতির একটি প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন। বহুত্ববাদী সমাজে সর্বজনীন গণতন্ত্র নির্মাণে এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিহার্য।

বহু-দলীয় ব্যবস্থা:

ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় কাঠামো। স্বাধীনতার পর থেকে নিয়মিত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় মতাদর্শগত ভিন্নতা, সামাজিক ভিত্তি, শ্রেণিস্বার্থ এবং আঞ্চলিক

পরিচয়ের সার্থক রাজনৈতিক প্রতিফলন ঘটেছে। এর ফলে ভারতের গণতন্ত্র কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে এক জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ— ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC), ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP), আম আদমি পার্টি (AAP) এবং তেলুগু দেশম পার্টি (TDP)। প্রথম দুটি দল জাতীয় স্তরে প্রধান মেরু হিসেবে বিদ্যমান। অন্যদিকে, আপ (AAP) একটি উদীয়মান জাতীয় দল হিসেবে এবং টিডিপি (TDP)-র মতো দলগুলো নিজ নিজ রাজ্যে শক্তিশালী সামাজিক ও ভাষাগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত ১৯৮৯ সালের পরবর্তী জোট রাজনীতির যুগে আঞ্চলিক দলগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কেন্দ্রের ক্ষমতা কাঠামোকে আরও বেশি আলোচনামূলক, অংশীদারিত্বমূলক এবং সমঝোতানির্ভর করে তুলেছে।

ভারতে 'ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট' বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনী পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও এই দলীয় বৈচিত্র্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে বহুমাত্রিকতা প্রদান করেছে। আঞ্চলিক দলগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কেবল সংহতই করেনি, বরং জাতীয় নীতিনির্ধারণে আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলনও নিশ্চিত করেছে। পরিশেষে বলা যায়, এই বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রধান রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে।

বিচার বিভাগ ও মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব:

ভারতের বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হিসেবে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা ও শাসন বিভাগের যেকোনো পদক্ষেপের সাংবিধানিক বৈধতা পর্যালোচনার করতে পারে। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তাঁরা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন—যাকে ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধানের 'হৃদয় ও আত্মা' বলে অভিহিত করেছিলেন। একইভাবে, উচ্চ আদালতসমূহ ২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি অন্যান্য আইনগত অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ভারতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা একটি মৌলিক সাংবিধানিক নীতি, যদিও এটি কোনো একক অনুচ্ছেদে সরাসরি সংজ্ঞায়িত নয়; বরং সংবিধানের ১৩, ৩২, ১৩৬, ২২৬ ও ২২৭ অনুচ্ছেদের সম্মিলিত ব্যাখ্যা থেকে এই ক্ষমতার উৎস নির্ধারিত হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আদালত সংবিধানবিরোধী আইন বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে, যা ক্ষমতার বিভাজন ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সুদৃঢ় করে। ১৯৭৩ সালের ঐতিহাসিক কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলায় ১৩ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে ঘোষণা করে যে, সংসদ সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশোধন করতে পারলেও সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন বা ধ্বংস করতে পারে না। এই রায়ের মাধ্যমে "মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব"প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ভারতীয় সংবিধানের স্থায়িত্ব ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

উল্লেখযোগ্য যে, আদালত মৌলিক কাঠামোর কোনো নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারণ করেনি; বরং পরবর্তী বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে এর উপাদানসমূহ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে সংবিধানের প্রাধান্য, প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার বিভাজন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

১৯৭৫–৭৭ সালের জরুরি অবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা এই তত্ত্বের গুরুত্বকে আরও সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত করে। পরবর্তী বিভিন্ন মামলায়— যেমন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন-সংক্রান্ত মামলা এবং মিনার্ভা মিলস মামলায় আদালত মৌলিক কাঠামো তত্ত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করে।

এছাড়াও, জনস্বার্থ মামলা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিচার বিভাগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা, কারাবন্দিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা নিয়ে বিতর্কও বিদ্যমান—বিশেষত ক্ষমতার সীমারেখা এবং গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে এক শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষাবলয় নির্মাণ করেছে। উক্ত তত্ত্বটি নিশ্চিত করে যে সাময়িক রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংবিধানের মৌলিক নীতিসমূহকে পরিবর্তন বা বিপর্যস্ত করতে না পারে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ও সুসংহত থাকে।

জরুরি অবস্থা (১৯৭৫–১৯৭৭): সংকট ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার:

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের নিকট পরামর্শ প্রদান করেন এবং সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে সারা দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার কারণ হিসেবে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা (Internal Disturbance) উল্লেখ করা হয়।

জরুরি অবস্থার অব্যবহিত পরেই বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয় এবং সংবাদমাধ্যমের ওপর পূর্বনিয়ন্ত্রণমূলক সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ কার্যত স্থগিত হয়ে যায় এবং ৩৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতে যাওয়ার অধিকার সীমিত করা হয়।

এই সময়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত হয় এবং শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন পাস করা হয়, যা সংসদের সংশোধনী ক্ষমতা সম্প্রসারিত করে এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করে। একই সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ সংযোজন করা হয় এবং কেন্দ্রের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী করা হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এডিএম যবালপুর বনাম শিবকান্ত শুক্লা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে জরুরি অবস্থাকালে হেবিয়াস করপাস আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে এবং ভারতীয় সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনগণ ভোটের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন ঘটায়। জনতা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে এবং জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ভারতের নির্বাচনী গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সচেতনতা গভীর সামাজিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণার শর্ত কঠোর করা হয়। অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার পরিবর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহ (Armed Rebellion) শব্দ ব্যবহার করা হয়। একই সঙ্গে নিশ্চিত করা হয় যে ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদভুক্ত অধিকার (দণ্ডবিধি সম্পর্কিত সুরক্ষা ও জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার) জরুরি অবস্থাতেও স্থগিত করা যাবে না।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ১৯৭৫–১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থা ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সংকট সৃষ্টি করেছিল। তবে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা পরিবর্তন এবং পরবর্তী সাংবিধানিক সংস্কার দেশের গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা ও সাংবিধানিক শাসনের শক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১০. সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সময়ে ভারতের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থিতিশীল হলেও এর কার্যকারিতা ও গুণগত মান নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক বিদ্যমান। প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ—

১. সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সাংবিধানিক ভারসাম্য

ণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাংবিধানিক গণতন্ত্র কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; বরং মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষা সমানভাবে অপরিহার্য। অতিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্য বহুত্ববাদী সমাজে সর্বজনীন নীতির ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে—এমন আশঙ্কা বিদ্যমান।

২. কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ

ভারত সংবিধানগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্র। তবে নীতিনির্ধারণ, জরুরি ক্ষমতা এবং আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী। পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) প্রবর্তনের পর কেন্দ্র–রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। যদিও এটি একটি সমন্বয়যুক্ত জাতীয় বাজার গঠনে সহায়ক হয়েছে, তবুও রাজ্যগুলোর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক বিদ্যমান।

৩. নির্বাচন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অর্থায়ন

ভারতে নিয়মিত, প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে। তবে নির্বাচনী ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধি, রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি অর্থ ও গণমাধ্যমের প্রভাব নির্বাচনী সমতার প্রশ্নকে আরও জটিল করে তুলছে।

৪. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নাগরিক স্বাধীনতা

সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও ১৯(২) অনুচ্ছেদে যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতার বিধান রয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং ডিজিটাল নজরদারি সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক দেখা গেছে। এ ধরনের বিষয়গুলোতে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করে চলেছে।

৫. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য

উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আয়, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য আজও প্রকট। গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলের ব্যবধান, শিক্ষাগত অসাম্য এবং কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের গভীরতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামগ্রিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

৬. নাগরিক সমাজ ও দায়বদ্ধতা

গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা রক্ষায় নাগরিক সমাজ, সামাজিক আন্দোলন এবং গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বর্তমানে বেসরকারি সংস্থার বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA)-এর প্রয়োগ এবং

প্রতিবাদী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নানাবিধ নীতিগত বিতর্ক বিদ্যমান। একই সঙ্গে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং নাগরিক অংশগ্রহণ যে কোনো সুস্থ গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

১১. তুলনামূলক তাৎপর্য

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে সামরিক হস্তক্ষেপ একটি কঠিন ও প্রায় অনিবার্য বাস্তবতা। পাকিস্তানে ১৯৫৮, ১৯৭৭ এবং ১৯৯৯ সালে সরাসরি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় সামরিক শাসন জারি ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানে একটি 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা' বিদ্যমান; বিশেষ করে ২০২৫ সালের ২৭তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সেনাপ্রধানকে 'চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা জাতীয় রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবকে আরও সুসংহত করেছে।

বাংলাদেশে ১৯৭৫-পরবর্তী এক দশকের প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পর, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী ১৮ মাস ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশেষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে একটি নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।

নেপালে দীর্ঘ সময় ধরে রাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও সরাসরি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেনি। তবে ২০২৫ সালে দুর্নীতিবিরোধী 'জেন জি' (Gen Z) আন্দোলনের পর সেখানেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, যারা ২০২৬ সালের মার্চে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ সত্ত্বেও সরাসরি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে প্রতিবেশী মিয়ানমারে ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে আজও তীব্র গৃহযুদ্ধ চলছে। অতি সম্প্রতি, ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল, জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং সামরিক নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে নিজেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের বাস্তবতা ব্যতিক্রমধর্মী। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে সেনাবাহিনী কখনও সরাসরি ক্ষমতা দখল করেনি। সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা সংবিধানসম্মতভাবে বেসামরিক সরকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে, যা দেশটিতে বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করেছে।

তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় ভারতের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার পেছনে কয়েকটি কাঠামোগত উপাদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—

১. সর্বজনীন সংবিধান

একটি আধুনিক রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ভর করে তার সংবিধানের সর্বজনীনতার ওপর। সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সুরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সুনির্দিষ্ট বিধানগুলো রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মূলত, একটি বহুত্ববাদী সমাজে এই সাংবিধানিক স্বীকৃতিই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সংহতিকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলে।

২. বিকেন্দ্রীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো

একটি বিকেন্দ্রীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মূলত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট বণ্টন, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন এবং একটি শক্তিশালী আর্থিক সমন্বয় প্রক্রিয়া ভারতের

মতো দেশে আঞ্চলিক পরিচয়কে সাংবিধানিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষাগুলো আর সংঘাতের পথে না গিয়ে সাংবিধানিক রাজনীতির মাধ্যমেই গঠনমূলক সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে।

৩. সামাজিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ

সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আধুনিক গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় ও প্রসারিত করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক অংশীদারিত্বে প্রান্তিক মানুষের প্রবেশাধিকার কেবল বেড়েছে তা নয়, বরং তা তুলনামূলকভাবে অধিকতর সর্বজনীন ও বিস্তৃত হয়েছে। মূলত, এটি শাসন ব্যবস্থায় সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে অর্থবহ করে তুলেছে।

৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ

একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' (Judicial Review) এবং মৌলিক কাঠামোর ধারনা (Basic Structure Doctrine) প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যবস্থার ফলে শাসন বিভাগ ও আইনসভার কর্মকাণ্ডের ওপর একটি কার্যকর ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, যা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে সাংবিধানিক সীমারেখা সুনিশ্চিত করে।

৫. নিয়মিত নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৫২ সাল থেকে ভারতে ধারাবাহিকভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার এক অনন্য উদাহরণ। ১৯৭৭, ১৯৮৯ বা ২০১৪ সালের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ রূপান্তর প্রমাণ করেছে যে, এ দেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তনে বিশ্বাসী। এই নির্বাচনী নিরবচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংহতিকে বিশ্বজুড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বজায় রেখেছে।

উপসংহার:

ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রা এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা প্রমাণ করে যে সামাজিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বহুত্ব এবং ধর্মীয় বহুমাত্রিকতা গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা নয়; বরং একটি সুশৃঙ্খল ও সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যকেই গণতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত এমন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন এবং কেন্দ্র-রাজ্য ভারসাম্যের সমন্বয়ে একটি বহুত্ববাদী সমাজকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে সুসংহত করেছে।

ভারতের সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল নয়; বরং এটি একটি জীবন্ত সামাজিক চুক্তির প্রতিফলন, যেখানে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছে; সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায়নীতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছে; এবং নিয়মিত ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে।

ভারতের স্বাধীন বিচার বিভাগ—বিশেষত সুপ্রিম কোর্ট—বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং মৌলিক কাঠামো ধারনার মাধ্যমে সংবিধানের মূল নীতিসমূহকে সুরক্ষিত রেখেছে। এমনকি ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার মতো গভীর সংকটকাল পেরিয়ে গণতন্ত্রের সফল পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রমাণ করেছে যে, ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক চেতনা এক শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে

একটি তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের পারদর্শিতা বিশ্বকে এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয় যে, গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা একটি সর্বজনীন সংবিধান, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণের মিলিত ফসল। বর্তমান সময়ে বিভক্ত ও মেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থায় ভারতের এই দীর্ঘ পথচলা প্রমাণ করে যে—রাষ্ট্র যদি তার সাংবিধানিক মূল্যবোধ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, তবে একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সমাজেও গণতন্ত্র কেবল টিকেই থাকে না, বরং তা অভাবনীয়ভাবে বহুমুখী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের এই দীর্ঘ অভিযাত্রা বহুত্ববাদী সমাজে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকতার এক অনন্য নিদর্শন। এটি প্রমাণ করে যে, বৈচিত্র্য নিজে থেকে বিভেদের কারণ নয়; বরং সুশাসন ও সাংবিধানিক ভারসাম্যের মেলবন্ধনে এই বৈচিত্র্যকেই জাতীয় ঐক্য এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভিত্তির প্রধান উৎসে রূপান্তরিত করা সম্ভব। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল গণতন্ত্রের প্রসার এবং নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতা এই যাত্রাকে আরও গতিশীল করেছে, যা ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তনশীলতা ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে নিরন্তর শক্তিশালী করে তুলছে।

গ্রন্থপুঞ্জি:

1. Austin, G. (1999). Working a democratic constitution: The Indian experience. Oxford University Press.
2. Chandra, K. (2004). Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India. Cambridge University Press.
3. Jaffrelot, C. (2003). India's silent revolution: The rise of the lower castes in North India. Columbia University Press.
4. Lijphart, A. (1977). Democracy in plural societies: A comparative exploration. Yale University Press.
5. Khilnani, S. (1997). The idea of India. Farrar, Straus and Giroux.
6. Stepan, A., Linz, J. J., & Yadav, Y. (2011). Crafting state-nations: India and other multinational democracies. Johns Hopkins University Press.
7. Varshney, A. (2002). Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India. Yale University Press.
8. Kohli, A. (1989). Politics of economic liberalization in India. World Development, 17(3), 305–328. https://www.princeton.edu/~kohli/docs/Liberalization03_1989.pdf
9. Yadav, Y. (1999). Electoral politics in the time of change: India’s third electoral system, 1989–99. Economic and Political Weekly, 34(34/35), 2393–2399. https://www.jstor.org/stable/4408334
10. The Hindu. (2025, November 12). Pakistan’s National Assembly passes 27th Constitutional Amendment Bill. The Hindu.

https://www.thehindu.com/news/international/pakistans-national-assembly-passes-27th-constitutional-amendment-bill/article70271921.ece

11. Prasad, K. B. R. (2018). Federalism and regionalism in India: Political accommodation of identity. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 6(2), 853–859. https://ijcrt.org/papers/IJCRT1893284.pdf
12. Jayal, N. G. (2022). Reinventing the republic: Faith and citizenship in India. Studies in Indian Politics, 1–17. https://doi.org/10.1177/23210230221082799
13. Dey, Y. (2022). The status of Indian democracy: Contextualising trends of representation in the Lok Sabha. Social and Political Research Foundation (SPRF). https://sprf.in/wp-content/uploads/2022/05/SPRF-2022_DP_Status-of-Indian-Democracy_Final-1.pdf
14. Ali, M. T., & Ray, A. (2024, October 14). Diversity and democracy: Why India remains politically stable in a volatile South Asian neighbourhood. South Asia Monitor. https://www.southasiamonitor.org/spotlight/diversity-and-democracy-why-india-remains-politically-stable-volatile-south-asian
15. Philip Oldenburg. (2007). India's democracy: Illusion or reality? Education About Asia, 12(3). https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/indias-democracy-illusion-or-reality/